সত্যজিতের 'রবীন্দ্রনাথ' : ফিরে দেখা, ২০০৮

সমীর সেনগুপ্ত

'পূর্ণ'তে দিয়েছিল ছবিটা, বোধহয় 'ক্ষুধিত পাষাণ' -এর সঙ্গে। ইন্টারভ্যালের আগে 'রবীন্দ্রনাথ' দেখাত, ইন্টারভ্যালের পরে মূল ছবি। দিনের পর দিন টিকিট কেটে হলে ঢুকে , ডকুমেন্টারিটা দেখে বেরিয়ে আসতুম। সবশুদ্ধ চোদ্দ-পনেরোবার দেখেছিলাম ছবিটা এইভাবে - তখনো বয়স একুশ পূর্ণ হয়নি।

তারপর কেটে গেল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এই লেখাটা লেখবার জন্যে পড়ার ঘরে বসে কম্পিউটারের সি-ডি চালিয়ে ছবিটা অবার দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, আজ যদি সত্যজিৎ এই ছবিটা আবার করতেন - তাঁর কাছেই সিনেমা দেখতে শিখে সেই মানদণ্ডেই যাঁকে আমরা পরের যুগে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সেই ক্লান্ত ও রোগজীর্ণ সত্যজিৎ নন - ১৯৫৮ সালের সত্যজিৎ, সাঁইত্রিশ বছরের ঝকঝকে পরিণত যুবক, 'পথের পাঁচালী' 'পরশপাথর' 'জলসাঘর' করে -ওঠা জগজ্জয়ী সত্যজিৎ রায় - আজ আমরা চাইতে পারতাম তাঁর কাছে? বা ধরা যাক, আর বছর তিনেক পরেই তো রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান আসছে, তখন যদি আরেকটা ছবির কথা ভাবা হয় - কেমন হবে সেই ছবিটি? কোন রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রতিফলিত দেখতে চাইব সেখানে?

সত্যজিতের ছবি শিল্পগুণে তুলনাহীন - যা -ই তিনি সৃষ্টি করেছেন, অসামান্য সুন্দর করে করেছেন, তাঁর কাজের, তাঁর ভাষায় 'এস্থেটিক ভ্যালিডিটি' বা নান্দনিক সিদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা অবান্তর। এই তথ্যচিত্রেরও 'চিত্র' অংশটি নিয়ে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু এতদিন পর দেখতে গিয়ে 'তথ্য' অংশে তাঁর নির্বাচন নিয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরি হল মনে - সেগুলি সসংকোচে নিবেদন করি।

দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়কার কলকাতা দেখানোয়, তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয়দানে। দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগে মনে, এর কি খুব দরকার ছিল? প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী-র প্রথম খণ্ডটি দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয়নি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতির জীবনী হয়েছে' –এই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায় আমাদের। দ্বারকানাথ কীসের ব্যবসা করতেন, ইংলন্ডে গিয়ে যে তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন, তাঁর বন্ধুদের তালিকায় যে ছিলেন ডিকেন্স, থ্যাকারে ও ম্যাক্সমূলের, তাঁকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন যে স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া - দর্শককে এই খবরগুলি জানানোর যৌক্তিকতা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয় না। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী? বিষয়কর্মে মন না - দেওয়ার জন্য ইংলন্ড থেকে ভর্ৎসনা করে জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন তিনি - সে চিঠির প্রতিলিপিও দেখানো হয়েছে ছবিতে - এই তথ্যেরই বা দরকার কী ছিল? দেবেন্দ্রনাথ যে প্রথম যৌবনে অতিমাত্রায় বিলাসী ছিলেন, ঠাকুরমায়ের অন্তর্জলি - কালে গঙ্গাতীরে বসে তাঁর ভাবান্তর হয়, ঈশোপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতায় ''ইশাবাস্যমিদং সর্বং ...'' শ্লোকটির সন্ধান পেয়ে, তাঁর উপর নির্ভর করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের দর্শন নির্মাণ করে তোলেন, এসব তথ্যও এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। রামমোহনকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে সতীদাহের দৃশ্য পর্যন্ত দেখানো হয়েছে, যে সতীদাহ আইন করে বন্ধ হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের জন্মের বত্রিশ বছর আগে - যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসুও - এবং সতীদাহের দৃশ্যের পরেই নাটকীয়ভাবে দ্যালাক্রোয়ার বিখ্যাত 'স্বাধীনতা' ছবিটি। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখানো হয়েছে বেশ অনেকখানি সময় নিয়ে, কিন্তু বিদ্যাসাগর - যাঁর কাছে পনেরো বছরের রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন 'ম্যাকবেথ' -এর বঙ্গানুবাদ দেখাতে, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অতিমানবের মতো ভক্তি করতেন - তাঁর উল্লেখমাত্র নেই।

অথচ বালক রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রথম দেখতে পেলাম আমরা, তখন ৫১ মিনিটের ছবির প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে।

হয়েছে কী, রবীন্দ্রনাথকে দেখবার যে চোখ আমাদের, তার উপরে অনেকগুলি পর্দা পড়ে আছে; তথাকথিত 'আভিজাত্য' তেমনই একটি পর্দা। আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ হল বিপুল পরিমাণে অনুপার্জিত সম্পদের উপর পুরুষানুক্রমিক অধিকার - এবং সে - সম্পদ আসতে হবে কৃষি থেকে, অনেক মানুষ তাঁকে প্রভু বলে, রাজা বলে মানবে। যদি কারখানা বা ব্যবসা থেকে তাঁর ধন এসে থাকে, তাহলে তাঁকে অন্য যা-ই বলা যাক, অভিজাত বলা যাবে না। এই আভিজাত্য প্রচুর অন্যায় এবং প্রচুরতর কুরুচির জন্ম দিয়েছে, তার সঙ্গে কোথাও কোথাও অবশ্য সুকুমার সংস্কৃতির চর্চাও হয়েছে কিছু কিছু। আমরা যারা ছাপোষা মধ্যবিত্ত, আমাদের ভূমিলগ্ন পূর্বপুরুষদের এঁরা প্রভু ছিলেন, ফলে এঁদের প্রতি তাঁদের একটা সম্ভ্রমের ভাব ছিল, রাজার প্রতি প্রজার যেমন থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এঁদের নিজের তুলনায় উৎকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য করতেন। সেই ধারণাটার উত্তরাধিকার আমাদের মধ্যেও রয়ে গেছে - অভিজাত শুনলে আমরা এখনো কিঞ্চিৎ নড়ে চড়ে বসি। রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ছিলেন না, তিনি যে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ছিলেন, 'অভিজাত' ছিলেন, এই তথ্যটিকেও যেন তাঁর একটি গুণ হিসেবেই ব্যবহার করতে চাই আমরা, সত্যজিৎও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথকে তেমন পছন্দ করতেন না, তাঁর সংক্রান্ত কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দিয়েছিলেন – এসব জেনেও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক আলোচনায় দ্বারকানাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয় না। আঠারো - উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে দ্বারকানাথ অবশ্যই অন্যতম প্রধান পুরুষ, তাঁকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজনও অবশ্যই আছে – কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বোধহয় নয়।

আরেকটি এই রকম পর্দা হল দেবেন্দ্রনাথের মহর্ষিত্ব। সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও পিতৃঋণ শোধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি, এই কাহিনী বহুবিখ্যাত - সেই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের, তাত্ত্বিকভাবে উদ্গাতা না হলেও প্রধানতম স্থপতি হিসেবে, তাঁর ধর্মীয় ভাবমূর্তির সম্মানে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকটাই উঁচু একটি বেদীর উপর তাঁকে বসিয়ে রেখেছি আমরা। কিন্তু তিনি যে মিথ্যে মামলায় বিধবা ভ্রাতৃবধূকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন তাঁর জমিদারিতে প্রজাপীড়নের খবর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা-য় বেরিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল - প্রথম জমিদারি হাতে নিয়ে নিজেদের কাছারিতে 'মার ধোর কয়েদ' ইত্যাদিরও ব্যবস্থা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চিঠিপত্রে তার স্বীকৃতিও আছে - দেবেন্দ্রনাথের মহর্ষিত্বের আলোচনায় এই তথ্যগুলিকে আমরা ভুলে থাকি, বা ফোকাসের মধ্যে আনি না। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার সংবাদ কাগজে বেরোনো বন্ধ করতে দেবেন্দ্রনাথ ৫২ টাকা খরচ করেছিলেন, সে খবরও ক্যাশবহি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন প্রশান্তকুমার পাল। আই.সি.এস পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ যখন তাঁর বালিকা বধূকে বিলেতে নিয়ে যাবার জন্যে পিতার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কঠোরভাবে লিখলেন, তিনি যেন 'পারিবারিক মর্যাদায় হস্তক্ষেপ' না করেন। পারত্রিক উন্নতির চেয়ে ঐহিক মর্যদার মূল্য যে তাঁর কাছে কিছুমাত্র কম ছিল এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীর মধ্যে প্রবেশ করবার পর থেকে, অন্তত তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সত্যজিতের সঙ্গে আমাদের কোনো তর্ক নেই। তাঁর জীবনের প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো ঘটনাগুলিকেই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে; তথ্যের ছোটখাট অপলাপ চোখে পড়ে আজ (সেদিন পড়েনি - যেমন ''হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু'' গানটিকে শিলাইদহ - পর্বে শোনানো হয়েছে, কিন্তু গানটি রচিত হয়েছিল 'চণ্ডালিকা'র জন্য, এই পর্বের প্রায় চল্লিশ বছর পরে), কোনো কোনো অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ নেই দেখে একটু অস্বস্তি হয় - যেমন তাঁর প্রথমবার শান্তিনিকেতনে যাওয়া, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু। তবে, সেকালে অধিগম্য তথ্যের অভাব, অল্প সময়সীমার মধ্যে প্রচুর কথা বলবার বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি কারণের কথা ভেবে এগুলোকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন হয় না

তর্কটা ওঠে অন্য জায়গায়। বিশ শতকে পৌছবার পর থেকে, আমরা অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথ বলে ধীরে ধীরে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা হল জনতার দ্বারা অনুমোদিত রবীন্দ্রনাথের সরকারি ভাবমূর্তি - তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নয়। চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ, গোটাকুড়ি গ্রন্থের লেখক, বিখ্যাত পত্রিকা - সম্পাদক, পাঁচটি সন্তানের জনক, স্থির করলেন, সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন - অন্য রকম একটি বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই তার প্রধান সমস্যা অর্থাভাব, খরচ চালাতে গিয়ে বিকরি করে দিলেন নিজের পুস্তকাদির স্বত্ব, পত্নী খুলে দিলেন তাঁর গায়ের গহনা। বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার ছ-মাসের মধ্যে পত্নীর মৃত্যু, তার কয়েক মাস পরে মধ্যমা কন্যার মৃত্যু, তাঁর দু'বছর পরে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। এই সময় আরম্ভ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন - তার তরঙ্গশীর্ষে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ, গান লিখে, শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিলেন দিনটিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখীবন্ধন উৎসব করে। কিন্তু তার পরেই সহিংস আন্দোলন আরম্ভ হল, তার শহিদদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সমবেদনা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কাজকে সমর্থন করলেন না - আন্দোলন থেকে সরে এলেন।

কথাটা ঠিক নয় পুরোপুরি - সত্যজিৎ অপ্রিয় প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সহিংস আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ততটা নয়, যতটা অন্যান্য নেতাদের দ্বিচারিতায়। গান লিখেছিলেন ২৮ মার্চ ১৯০৬ তারিখে : ''বিদায় দেহো ক্ষম আমায় ভাই, কাজের পথে আমি তো আর নাই।'' অবশ্য এড়িয়ে না গিয়ে তাঁর হয়তো উপায়ও ছিল না, কারণ ছবিটি তৈরি করবার বরাত দিয়েছিল ফিল্মস ডিভিশন, তারা স্বভাবতই ছবি নিয়ে কোনো বিতর্ক চায়নি।

পঞ্চাশ বছর বয়স হলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশবাসীরা সংবর্ধনা দিলেন - কিন্তু সেই সংবর্ধনার পিছনে কত রাজনীতি কত তর্ক কত কালিমা ছিল তার কোনো ইঙ্গিত নেই ছবিতে, যেন তার শ্রেষ্ঠতায় অভিভূত দেশবাসী সম্পূর্ণ একমত হয়ে এই সংবর্ধনা জানিয়েছিল! তাঁর জীবনী যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা জানেন, ব্যাপারটা অত সহজে হয়নি। দ্বন্দ্বটি চাপা পড়ে যাওয়ায় বিষয়টির একটু অতিসরলীকরণ ঘটে গিয়েছে।

এর পর স্বভাবতই এসে গেল ১৯১২ সালে তাঁর ইংলন্ডে যাওয়ার কথা (সত্যজিৎ বলেছেন, তিনি গিয়েছিলেন ইউরোপের বিদ্যালয়গুলি দেখতে; কিন্তু আমরা জানি তিনি গিয়েছেলেন অর্শরোগের চিকিৎসা করাতে, এবং বিশ্রাম নিতে)। তারপরে এল নোবেল পুরস্কার, এবং তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই হয়ে ওঠেন একজন জীবনের চেয়ে বড়ো চরিত্র : যিনি সর্বদাই আদর্শের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ, মানুষের মঙ্গলকামনা ছাড়া যাঁরা মাথায় আর কোনো চিন্তা নেই, বিশ্বভারতী স্থাপন করে, সমস্ত যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীতে তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা ছড়িয়ে দেবার জন্য বারংবার ইউরোপ আমেরিকা ক্যানাডা চীন জাপান চিলি আর্জেন্টিনা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সরকারি ভাবমূর্তির তলায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছবিটি চাপা পড়ে যায়।

এদিকে ভারতবর্ষে রাউলাট আইন প্রবর্তিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ আবার রাজনীতির মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছেন। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন - তাঁর গ্রেপ্তারের ভুল খবরে জনতা উত্তেজিত হয়ে কোথাও কোথাও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাল - সেই সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন ভয়ংকর কঠোরভাবে আন্দোলন দমন করতে পথে নামল, অত্যাচার চরমে উঠল জালিয়ানওয়ালাবাগে, বন্ধ জায়গায় মেশিনগানের গুলিতে স্ত্রীলোক ও শিশু সহ সাড়ে তিনশো লোক নিহত, আহত বারোশো। ভারতরক্ষা আইনের ভয়ে নেতারা কেউই সাহস করে প্রতিবাদ জানালেন না; কাউকে পাশে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ একলাই দাঁড়ালেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে - ১৯১৫ সালে পাওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে, তার দ্বারা ব্রিটিশের দুর্বলতম স্থান তার মর্যাদাবোধে মর্মান্তিক

আঘাত করলেন।

পরবর্তী দশ বছর রবীন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা পৃথিবীতে- বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। যেখানে যাচ্ছেন, বলছেন বিশ্বশান্তির কথা, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার কথা। ওদিকে শান্তিনিকেতনে আসছেন সারা পৃথিবী থেকে পণ্ডিতরা, বিশ্বের সংস্কৃতির চর্চা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বিদেশীরা কেউ কেউ - অ্যান্ডরুজ, পিয়ার্সন, এল্‌মহার্স্ট - তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে শান্তিনিকেতনকে দান করেছেন তাঁদের জীবনের একটা বড়ো অংশ। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দিলেন - দ রিলিজিয়ন অব ম্যান, মানুষের ধর্ম। সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে মানবতার নতুনতম কীর্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। সত্তর বছর বয়সে আরম্ভ করলেন ছবি আঁকতে। পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি দিয়ে যার আরম্ভ, তা ক্রমশ হয়ে উঠছে ভারতীয় আধুনিকতার অগ্রদূত, এমন ছবি যার মধ্যে ভারতীয়তাও আছে আধুনিকতাও আছে। তাঁর আগে, বা তাঁর পরেও সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যাঁরা ছবি এঁকেছেন তাঁরা আর ভারতীয় থাকেন না, যিনি ভারতীয় থাকেন তিনি আর আধুনিক হয়ে ওঠেন না, রবীন্দ্রনাথই প্রথম, এবং এখন পর্যন্ত প্রায় একমাত্র ভারতীয় চিত্রশিল্পী, আধুনিকতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও যাঁর ছবি সমভাবে গ্রহণীয়। পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে ছবি জাগতে তাঁর ক্রম - উত্তরণটি সত্যজিৎ চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু বিবরণীতে তেমনভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

১৯৩১ সালে কলকাতার মানুষ তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিন পালন করলেন মহাসমারোহে - সমস্ত পৃথিবীর সেরা মানুষেরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন দ গোল্ডেন বুক অব টেগোর - এর মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে। গ্রন্থটির আহ্বায়ক হয়েছিলেন রোমা রোলাঁ, আইনস্টাইন ও গ্রীক কবি কস্টিস পালামাস - ভারতবর্ষ থেকে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধী।

শেষ দশকটি কাটল প্রধানত শান্তিনিকেতনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটির ঝোঁক শিল্পসাহিত্য থেকে সরে গিয়ে পড়ছে রাজনীতির উপর - নেহরুকে দেখানো হয়েছে, সুভাষচন্দ্রকে, গান্ধীজিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল - রবীন্দ্রনাথ লিখে উঠলেন 'সভ্যতার সংকট'। ছবি শেষ হয় সভ্যতার সংকট থেকে পাঠ, তারপর ''ওই মহামানব আসে'' গান দিয়ে - এর চেয়ে সুশোভন সমাপ্তি এই মহৎ তথ্যচিত্রের কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আমাদের অতৃপ্তি থেকে যায় অন্য জায়গায়। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে এসেছে সেদিনকার তুলনায়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জনরুচি ক্রমশ অবক্ষয়িত হচ্চে। রবীন্দ্রনাথ বলতে যে ছবিটি আজ সাধারণ মানুষের মনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর একটি অতিসুকুমার ভাবমূর্তি। প্রায় অলৌকিক সুন্দর একজন মানুষ - এবং তিনি জানেন যে তিনি সুন্দর, এবং নিজের ঠিক সেই ভাবমূর্তিই তিনি প্রতিফলিত করতে চান; এমন পোশাক পরেন যা তাঁর দেশবাসী অন্য কেউ পরবার কথা কল্পনা করতে পারেন না; আশি বছর বয়সে ফুলের মালা গলায় পরে বসে থাকেন। সমস্ত মিলিয়ে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ অতিললিত বলেই মনে হতে পারে।

মনে হতেই পারে, যদি এই মানুষটিকে অন্য দিক থেকে দেখবার শিক্ষা সত্যজিতের মতো আর্টিস্টের কাছ থেকে না পাই আমরা। এই অতিললিত ভাবমূর্তিটি আড়াল করে রাখে তাঁর অপরাজেয় পৌরুষকে। কী দরকার ছিল তাঁর, শান্তিনিকেতনের মতো জনহীন জলহীন প্রান্তরে ইস্কুল স্থাপন করে, তার পিছনে সমস্ত জীবন, জীবনের সমস্ত সংস্থান ফুরিয়ে ফেলবার? অর্থ নেই, সহকর্মী নেই, কথা বোঝে এমন মানুষ নেই - অর্ধেক জীবন ধরে, ব্রহ্মবিদ্যালয় আর তার পরে বিশ্বভারতীর পিছনে পরিশ্রম দিয়ে বেড়ানো, পঁচাত্তর বছর বয়সে নাচের দল নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানো টাকা তোলার জন্য : এর পিছনকার বিরাট পৌরুষের ছবিটি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করে ধরবেন সত্যজিতের মতো শিল্পী, ছবিটি দেখে আমাদের এই আশা পূরণ হয় না। শান্তিনিকেতনের প্রায় গ্রীষ্ম যিনি কখনো ফ্যান চালাননি, দরজা জানলা বন্ধ করে তপ্ত হাওয়াকে আটকাননি, এমনকী গরমের ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া বাতিল করে শান্তিনিকেতনে রয়ে গেছেন - রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই কৃচ্ছ্রসাধনের দিকটি, পৌরুষের সাধনাটি সত্যজিতের ছবিতে একেবারেই অধরা রয়ে গেছে।

আরেকটি দিকও ধরা পড়েনি - সেটি হল, তাঁর একাকীত্ব। সারা জীবন এই মানুষটি নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। বন্ধু বলে যাঁরা তাঁর কাছাকাছি এসেছিলেন, তাঁর প্রায় কেউই তাঁর যোগ্য ছিলেন না, যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেককেই আগেভাগে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মৃত্যু - যেমন প্রিয়নাথ সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী - কেউ কেউ অন্য কারণে দূরে সরে গেছেন - যেমন জগদীশচন্দ্র। পর্বতশৃঙ্গের মতো তিনি চিরকাল নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতাকে তিনি কেমন করে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর শিল্পে কবিতায় গানে ছবিতে সেই সূত্রটি আমরা এই ছবি থেকে পাব বলে আশা করি, কিন্তু নিরাশ হতে হয় আমাদের। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার সামাজিক মূল্য যত বাড়ছে, আমরা ব্যক্তিগত মূল্য কমে যাচ্ছে, কেউ আর আমাকে ভালোবাসতে সাহস করে না।' ব্যক্তিগত মুল্যের ভিখারী সেই রবীন্দ্রনাথকে দেখাই তাঁকে সত্যিকার দেখা।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিটির কোনো তুলনা নেই। সেই সময়ের তথ্যের দারিদ্র্য ও ফিল্মস ডিভিশনের নানা জাতীয় নিষেধের মধ্যে থেকেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে নির্মাণ করে তুলছেন তা আমাদের চিরকালীন সম্পদ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করতেও তো বাধা নেই যে এর পর আরো ছবি হবে তাঁকে নিয়ে, পঞ্চাশ মিনিটের বদলে চার ঘন্টার তথ্যচিত্র করতেই বা বাধা কোথায়, যেখানে আমাদের এই সর্বতোপ্রিয় আশ্চর্য মানুষটি প্রতিভাত হবেন তাঁর ব্যক্তিত্বের সমস্ত কড়ি ও কোমল নিয়ে, তাঁর চরিত্রের সমস্ত বাঁক ও ঋজুতা নিয়ে, তাঁর সমগ্রতা নিয়ে ও ঋজুতা নিয়ে, তার সমগ্রতা নিয়ে।

আমরা আশা করে থাকব।